সুরক্ষিত শৈশব, নিরাপদ আগামী

নাসরীন জাহান লিপি

একটি শিশুর হাসিমুখ একটি পরিবারের, তথা একটি রাষ্ট্রের সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য। কিন্তু প্রায়ই আমরা এমন ভয়াবহ ঘটনার মুখোমুখি হচ্ছি, শিশুর নিষ্পাপ হাসিকে মুছে দিচ্ছে বারবার। নিষ্পাপ ফুলের মতো আছিয়া, রামিসা, আব্দুল্লাহ অকালে ঝরে যাচ্ছে গোটা দেশকে কাঁদিয়ে। আমরা আমাদের দেশকে শিশুদের জন্য নিরাপদ করতে চাই। প্রশ্ন হচ্ছে, এই চাওয়া কবে পূরণ হবে? শিশুদের প্রতি যৌন সহিংসতা ও নির্যাতনের ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে। পত্রিকার পাতায়, সোশ্যাল মিডিয়ায় চোখ রাখলেই দেখা যায় কোথাও না কোথাও শিশু ধর্ষণ, খুন, শারীরিক নির্যাতন কিংবা অনলাইনে হয়রানির ঘটনা ঘটেছে। অনেক সময় অপরাধী হয় পরিচিত কেউ আত্মীয়, প্রতিবেশী, শিক্ষক, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তি কিংবা পরিবারের ঘনিষ্ঠ মানুষ। ছোট্ট শিশুর প্রতিরোধ ক্ষমতা নেই, সহজ শিকারে পরিণত হয়ে খুন হচ্ছে আমাদের সন্তানরা। আর যারা বেঁচে থাকছে, তারা ভয়, লজ্জা ও বিভ্রান্তিতে চুপ করে থাকে। বড়োরাও যেন বুঝতে পারছেন না কীভাবে সুরক্ষিত রাখবেন আদরের টুকরোকে। সমাজ-রাষ্ট্রকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাচ্ছে অমানুষদের দৈরাত্ম। কিন্তু, এভাবে আর কতদিন?

শিশুরা বেশি ঝুঁকিতে পড়ে, কেননা শিশুরা স্বাভাবিকভাবেই বড়োদের বিশ্বাস করে। তারা বুঝতে পারে না কোন আচরণ নিরাপদ আর কোনটি বিপজ্জনক। অপরাধীরা প্রায়ই শিশুকে ভয় দেখায়, উপহার দেয়, গোপন কথা রাখতে বলে বা আবেগের সুযোগ নেয়। অনেক পরিবারে মুক্তমনে আলোচনার পরিবেশ না থাকায় শিশুরা বিপদের ভাষাও শিখে না। এছাড়া সামাজিক কিছু সমস্যাও শিশু নির্যাতনের ঝুঁকি বাড়ায়। যেমন, ক্ষমতার অপব্যবহার, শিশুদের মতামতকে গুরুত্ব না দেওয়া, “চুপ থাকাই ভালো” সংস্কৃতির চর্চা, অপরাধীর সামাজিক প্রভাব, অনলাইন নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে, নীরবতাই অপরাধীদের শক্তি বাড়ায়। শিশু সুরক্ষা শুধু আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাজ নয়; এটি পরিবার, বিদ্যালয়, সমাজ ও রাষ্ট্র - সবার যৌথ দায়িত্ব। শিশু ধর্ষণ ও নির্যাতন রোধে কেবল কঠোর আইনই যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা, পারিবারিক শিক্ষা এবং সম্মিলিত প্রতিরোধ।

শিশুকে ভয় দেখিয়ে নয়, সচেতন করেই নিরাপদ রাখা যায়। সচেতনতার শুরু হোক পরিবার থেকে। কেননা একটি শিশুর প্রথম পাঠশালা হলো তার পরিবার। ছোটোবেলা থেকেই তাদের কয়েকটি বিষয় শেখানো প্রয়োজন, যেমন নিজের শরীর নিজের, শরীরের ব্যক্তিগত অংশ সম্পর্কে ধারণা, কেউ অস্বস্তিকরভাবে স্পর্শ করলে “না” বলা, ভয় পেলেও বিশ্বস্ত বড়ো কাউকে জানানো, গোপন স্পর্শ বা গোপন কথা কখনো লুকিয়ে না রাখা। শিশুকে বোঝাতে হবে অন্যায় যে করে সে অপরাধী আর লজ্জা দিতে হবে কেবল অপরাধীকে, ভুক্তভোগীকে নয়। শিশুকে সুরক্ষিত রাখতে বাবা-মাকে খুব ছোটোবেলা থেকেই অত্যন্ত সহজ ভাষায় শরীরের গোপনীয়তা এবং ‘নিরাপদ স্পর্শ’ ও ‘অনিরাপদ স্পর্শ’ সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে।

সহজ যোগাযোগের পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে পরিবারে। সন্তানদের সাথে এমন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলুন যেন তারা যেকোনো ভয়, দ্বিধা বা অস্বস্তি ছাড়াই আপনার সাথে সব শেয়ার করতে পারে। অপরিচিতদের থেকে

সাবধানতা শেখান শিশুকে। কোনো অপরিচিত ব্যক্তি চকলেট, খেলনা বা অন্য কিছুর প্রলোভন দেখালে যেন তারা প্রলুব্ধ না হয়, সেই শিক্ষা দিন।

পরিবার শিশু সুরক্ষার প্রথম আশ্রয়। বাবা-মা বা অভিভাবকদের উচিত শিশুর কথা মন দিয়ে শোনা, আচরণে হঠাৎ পরিবর্তন হলে গুরুত্ব দেওয়া। অনেক সময় শিশু সরাসরি কিছু বলতে পারে না। ভয়, চুপচাপ হয়ে যাওয়া, হঠাৎ রাগ, ঘুমের সমস্যা বা নির্দিষ্ট কারো কাছে যেতে না চাওয়া এসবও সংকেত হতে পারে। শিশুকে অপমান বা দোষারোপ করবেন না কখনো। শিশুর অনলাইন ব্যবহারে নজর রাখা, "বড়োদের সব কথা মানতেই হবে" এমন শিক্ষা না দেওয়া এখন জরুরি হয়ে গেছে।

"মান-সম্মানের" ভয়ে অপরাধ চাপা দিলে অপরাধী আরও সাহস পায়। বরং শিশুর পাশে দাঁড়ানো এবং দ্রুত আইনি সহায়তা নিশ্চিত করাই মানবিক কাজ। স্কুলে-কোচিং সেন্টারে-মাদ্রাসায় শিশু সুরক্ষা নীতি থাকা জরুরি। শিক্ষক, কোচিং সেন্টার, মাদ্রাসা, হোস্টেল সব জায়গায় নজরদারি ও জবাবদিহি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারিনি আমরা, পারতেই হবে। শিশু যেন অভিযোগ করতে পারে এমন নিরাপদ ব্যবস্থা থাকতেই হবে।

সমাজেরও দায়িত্ব আছে। অপরাধীরা প্রায়শই সমাজের নীরবতার সুযোগ নেয়। তাই সামাজিক স্তরে কিছু পরিবর্তন জরুরি। আমরা যখন ছোট ছিলাম, পাড়া-মহল্লায় মুরব্বিদের নজরদারি ছিল। নিজ এলাকার শিশুদের প্রতি প্রতিবেশীদেরও এক ধরনের অভিভাবকত্ব থাকা উচিত। কোনো শিশুর আচরণে অস্বাভাবিকতা দেখলে বা কাউকে সন্দেহজনক মনে হলে সাথে সাথে খোঁজ নেওয়া প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যবশত কোনো ঘটনা ঘটলে শিশুর পরিবার বা শিশুকে দোষারোপ করার মানসিকতা ঝেড়ে ফেলতে হবে। সমাজকে অপরাধীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে, ক্ষতিগ্রস্ত শিশুর পাশে দাঁড়াতে হবে।

প্রযুক্তির যুগে সতর্কতা বহুমাত্রিক হওয়া প্রয়োজন। এখন অনলাইনে শিশুরা নতুন ধরনের ঝুঁকিতে পড়ছে। ডিজিটাল যুগে শিশুরা সহজেই ইন্টারনেটের সংস্পর্শে আসছে। অনেক সময় সাইবার জগতের ফাঁদও শিশুদের বিপদে ফেলে। অপরিচিত কেউ বন্ধুত্ব করে ব্যক্তিগত ছবি চাইতে পারে, ভয় দেখাতে পারে বা প্রতারণা করতে পারে। তাই শিশুদের শেখাতে হবে ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার না করা, অপরিচিত কারো সঙ্গে একা যোগাযোগ না রাখা, সন্দেহজনক কিছু ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে জানানো। শিশুদের ডিভাইস ব্যবহারের সময় বড়োদের নজরদারি থাকা উচিত। তারা ইন্টারনেটে কী দেখছে বা কার সাথে যোগাযোগ করছে, সে বিষয়ে সচেতন থাকা জরুরি।

যেকোনো শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে বা এ ধরনের ঘটনার আশঙ্কা দেখা দিলে দ্রুত সরকারি সহায়তা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। এ ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সহায়তার জন্য ১০৯৮ শিশু সহায়তামূলক হেল্পলাইনে, জরুরি পরিস্থিতিতে ৯৯৯ জাতীয় জরুরি সেবায়, অথবা ১০৯ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেলে যোগাযোগ করা যেতে পারে। এসব সেবা নির্যাতনের শিকার শিশুদের সুরক্ষা, উদ্ধার, পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় আইনি সহায়তা প্রদানের জন্য সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করে। তাই শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কোনো ঘটনা বা ঝুঁকির তথ্য জানা মাত্র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা উচিত।

শুধু সচেতনতা পারবে না শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধ করতে। দরকার আইনের কঠোর প্রয়োগ ও দ্রুত বিচার। ২০১৮ সালে পাকিস্তানের কাসুর এলাকায় ৭ বছর বয়সী শিশু জয়নব আনসারিকে অপহরণ, ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা পুরো বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। তীব্র জনরোষ এবং প্রশাসনের কঠোর অবস্থানের কারণে মাত্র ১ মাসের মধ্যে

মামলার তদন্ত শেষ করা হয়। অ্যান্টি-টেরোরিজম কোর্ট মাত্র ৪ দিনের টানা শুনানির পর অপরাধী ইমরান আলীকে ৪ বার মৃত্যুদণ্ড- দেয়। ঘটনার ৯ মাসের মাথায় অপরাধীর ফাঁসি কার্যকর করা হয়। পাকিস্তানের ইতিহাসে এটি ছিল দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন হওয়া কোনো হাই-প্রোফাইল বিচার।

বাংলাদেশে শিশু নির্যাতন ও ধর্ষণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আইন রয়েছে। বিশেষ করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন অনুযায়ী ধর্ষণ, যৌন নির্যাতন ও শিশু নির্যাতনের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান আছে। এরপরও মাগুরার আলোচিত শিশু আছিয়া ধর্ষণ-হত্যা মামলার এক বছর পার হলেও এখনো কার্যকর হয়নি মৃত্যুদণ্ডের রায়। ২০২৫ সালের ৫ মার্চ বোনের শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে ধর্ষণ ও হত্যার শিকার হয় আট বছরের আছিয়া। পরে ঢাকার সিএমএইচে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। ঘটনাটি দেশজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

আইনের ভয় না থাকলে অপরাধপ্রবণতা বাড়ে। শিশু ধর্ষণ রোধে বিচার ব্যবস্থার ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিশুদের বিরুদ্ধে হওয়া অপরাধের বিচার প্রক্রিয়া যেন দীর্ঘসূত্রী না হয়, সেজন্য বিচার হতে হবে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে। যখন একটি অপরাধের বিচার ১ থেকে ৬ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হয় এবং সাজা কার্যকর হয়, তখন সম্ভাব্য অপরাধীরা বুঝতে পারে যে অপরাধ করে পার পাওয়া অসম্ভব। এটি সমাজে "কালচার অব ইম্পিউনিটি" বা "অপরাধ করেও পার পেয়ে যাওয়ার সংস্কৃতি" চিরতরে বন্ধ করতে সাহায্য করে। ভুক্তভোগী পরিবার যেন সহজেই আইনি সহায়তা পায় এবং কোনো ধরনের হয়রানির শিকার না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট-এর নির্দেশনায় শিশু সংক্রান্ত মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে দ্রুত সাক্ষ্যগ্রহণ ও শুনানির মাধ্যমে অপরাধীদের সাজা দেওয়া হয়েছে। এতে ভুক্তভোগী পরিবার কিছুটা হলেও ন্যায়বিচারের অনুভূতি পেয়েছে। কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সিসিটিভি, অভিযোগ বাক্স ও শিশু সুরক্ষা কমিটি চালু করার ফলে নির্যাতনের ঘটনা কমেছে এবং অভিযোগ গোপন রাখা কঠিন হয়েছে। অনলাইনে শিশু নির্যাতন বা ব্ল্যাকমেইলের ঘটনায় বাংলাদেশ পুলিশ-এর সাইবার ইউনিট দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে অনেক অপরাধীকে শনাক্ত করেছে।

বুঝতে হবে, যদি মামলা দীর্ঘদিন চলে তাহলে শিশু ও শিশুর পরিবার মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে, সাক্ষ্য দুর্বল হয়ে যায়, অপরাধীরা প্রভাব খাটানোর সুযোগ পায়, সমাজে ভয় ও অবিশ্বাস বাড়ে। অন্যদিকে দ্রুত বিচার হলে শিশুর আস্থা ফিরে আসে, অন্য অপরাধীরা সতর্ক হয়, পরিবার অভিযোগ করতে সাহস পায়। তবে শুধু শাস্তি নয়, প্রতিরোধও জরুরি। কঠোর আইন দরকার, কিন্তু তার পাশাপাশি দরকার শিশু-বান্ধব তদন্ত ব্যবস্থা, ভুক্তভোগীর মানসিক সহায়তা, সাক্ষীর নিরাপত্তা এবং পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সচেতনতা। কারণ একটি নিরাপদ সমাজ গড়ে ওঠে তখনই, যখন অপরাধীর ভয় থাকে এবং শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

আসুন, বিকৃত মানসিকতার বিরুদ্ধে আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ জায়গা থেকে দুর্গ গড়ে তুলি, যেন আর কোনো শিশুর শৈশব কেঁদে না ওঠে। একটি শিশুকে সুরক্ষিত রাখা মানে একটি প্রজন্মকে সুরক্ষিত রাখা। আইন, প্রশাসন আর সচেতন নাগরিকের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই পারে শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে।

#

লেখক : উপপ্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

পিআইডি ফিচার